গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১৫ - ২১ জুলাই, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

জি-৮ ভুক্ত আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শীর্ষ বৈঠক উপলক্ষে ৬ জুলাই স্কটল্যান্ডে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী প্রবল গণবিক্ষোভ হয়। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে এই বিক্ষোভে যোগ দেয়। পুলিশি বাধায় বিক্ষোভ তীব্র রূপ নিয়েছিল।

লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণের পর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও দখলদারি যে ইতিমধ্যেই অসংখ্য মানুষের জীবন নিয়েছে, বহু দেশের দুর্দশা বাড়িয়েছে, তার বিরুদ্ধে কি আরও বড়, আরও ব্যাপক বিরোধিতা দেখা দেবে? নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কর্পোরেট সাম্রাজ্যের অধিপতিদের পিছনকার রাজনৈতিক শক্তিগুলি তাদের যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের আগ্রাসী কর্মসূচি আরও জোরকদমে রূপায়ণ করার জন্য এই ঘটনাকে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে? এটাই এখন প্রগতিশীল আন্দোলনের সামনে একটি প্রশ্ন।

নিরপরাধ জনগণের এভাবে জীবনহানি ঘটানো — যাদের মধ্যে অধিকাংশই তখন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছিল — নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক এবং কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আর ঠিক এই কারণেই আজ আর কেবল সাধারণভাবে হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার কথা বললে চলবে না, দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে ইরাক ও আফগানিস্তানে দৈনিক বোমা-বর্ষণের বিরুদ্ধে, যেখানে অনেক অনেক বেশি ব্যাপকতায় নিরপরাধ জনগণের বিরুদ্ধে হিংসার ও সন্ত্রাসের বর্বর অধ্যায় রচিত হচ্ছে প্রতিদিন।

গত ১ জুলাই, আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের একটি গৃহস্থ বাড়িতে দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে বোমা মেরে মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান নারী-শিশু সহ কমপক্ষে ১৭ জন নিরপরাধ আফগান মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকী মার্কিন তাঁবেদার হামিদ কারজাই সরকার পর্যন্ত এই বোমাবর্ষণকে পুরোপুরি অন্যায্য বলে নিন্দা করেছে। তখন কোথায় ছিলেন আজকের পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী নেতারা? কেন তাঁদের মুখ থেকে কোনও মর্মবেদনা ও ধিক্কার শোনা যায়নি?

শহরে-গ্রামে, বিবাহ অনুষ্ঠানে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ, গভীর রাতে গৃহস্থের বাড়িতে সেনাবাহিনীর হামলা, বিছানা থেকে নির্দোষ মানুষকে টেনে হিঁচড়ে মেরে, রক্তাক্ত করে, হাত-পা মুখ বেঁধে কারাগার নামক অন্ধকূপে নিয়ে যাওয়া, সেখানে আরও বর্বর অত্যাচার, যৌননিপীড়ন, বিদ্রূপ, এমনকী বন্দী হত্যা, বুশ ও ব্লেয়ার সরকার কর্তৃক মধ্যপ্রাচ্যের হাজার হাজার মানুষকে ধরে বেঁধে, গোপন কারাগারে অনির্দিষ্টকাল বিচারহীন অবস্থায় ফেলে রাখা — এগুলিই দুনিয়ার অধিকাংশ স্থানে শান্তিকে চুরমার করে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার কারণ এটাই।

আমরা জানি না, লন্ডনের ঘটনার জন্য কারা দায়ী। ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে যে সরকারগুলো মিথ্যা বলেছে, তারা এই ঘটনা সম্পর্কে যে তথ্য দেবে, সিদ্ধান্ত করবে, তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি হামলা

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির নিন্দায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি হামলার পক্ষে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত ভাষণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ জুলাই নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

''মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনকারী ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের নৃশংস হামলার পক্ষে ওকালতি করেছেন, সেটা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, উদ্বেগজনকও বটে। অতীতের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের শাসনকালের মত সিপিএম পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমলেও যেকোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে পুলিশি অত্যাচার সম্পর্কে অভিযোগ উঠলে পুলিশের পক্ষে সাফাই দেওয়া এবং পুলিশি রিপোর্টকেই নির্বিচারে একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করা ও দেখানো রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষও সরকারি নির্দেশে বেপরোয়াভাবে 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষা'র নামে গণআন্দোলনে যথেচ্ছ দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

''এই বক্তব্যের দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সকল নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্রদেরও অসম্মান করেছেন। আমরা এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।''

ডি এস ও ঃ এ আই ডি এস ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল মুখ্যমন্ত্রীর এই অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

সরকার বিদ্যুৎনীতি না পাল্টালে বিক্ষুব্ধ মানুষ পথে নামতে বাধ্য হবে

একদিকে ব্যাপক হারে মাশুল বৃদ্ধি, অন্যদিকে নিম্নমানের পরিষেবা, তার সাথে বেআইনিভাবে খুশিমতো লাইন কাটা এবং ভুতুড়ে বিলের ব্যাপক আক্রমণের ফলে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষুব্ধ।

সকলেই আমাদের সাথে একমত হবেন যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা বাণিজ্যিক নীতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। কারণ সরকার একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়। বরং অর্থনৈতিক তাগিদেই সরকারকে বহু সময় উৎপাদন, বন্টন ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হতে হয়। এই দায়বদ্ধতা থেকেই গড়ে উঠেছে সরকারি এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি। অত্যন্ত দুঃখের এবং ক্ষোভের কথা হল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই দায়বদ্ধতা ঝেড়ে ফেলে বর্তমানে সরকার নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-কে দ্রুত কার্যকর করছে। তাই পর্ষদের মাশুল নীতি দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো, যা সম্পূর্ণভাবে জনস্বার্থবিরোধী। এই বাণিজ্যিক নীতিকে কার্যকর করার জন্যই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে দু'ভাগে বিভক্ত করে বর্তমানে আলাদা আলাদা সঞ্চালন ও বন্টন সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। পরিকল্পনা চলছে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ অনুযায়ী তাকে ৩/৪টি সংস্থায় বিভক্ত করার। এই বাণিজ্যিক নীতির ফলে ঘটে চলেছে একদিকে কর্মী সঙ্কোচন, অপরদিকে মাশুল বৃদ্ধি। তাই বেসরকারি সংস্থার মতোই রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে মাধ্যম করে প্রতি বছর ব্যাপকহারে মাশুল বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে।

এই জনস্বার্থবিরোধী নীতিকে প্রয়োগ করে ২০০৫-০৬ সালের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গ্রাহকের মাশুল বেড়েছে ইউনিট প্রতি ১৩ পয়সা হারে। বিদ্যুৎ আইন এবং কমিশনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মিটার না দিয়ে সবচেয়ে বড় মাশুল-আক্রমণ চালানো হয়েছে কৃষিতে। ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে যখন কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, যখন বেশিরভাগ রাজ্যে ৫০ পয়সা ইউনিটে কৃষকরা বিদ্যুৎ পাচ্ছে, যখন কৃষিতে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ফলে অন্ধ্রপ্রদেশে হাজার হাজার কৃষকের আত্মহত্যার কথা আমরা কেউ ভুলতে পারি না, তখন পশ্চিমবঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে কৃষিতে মাশুল বাড়ানো হয়েছে। এই ভয়াবহ ৭০ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধিই শেষ কথা নয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পর্ষদের চৌর্যবৃত্তি। কৃষকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে স্যালো টিউবওয়েল গ্রাহকদের সাবমারসেবলের বিল পাঠিয়ে বছরে আরও দু'হাজার টাকার মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ১০০ শতাংশের বেশি মাশুল বেড়েছে কৃষিতে। এর মারাত্মক ফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে তিনজন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী বোরো চাষে কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল শুরু হবে। কারণ স্যালো টিউবওয়েলের এবং সাবমারসেবলের মালিকরা এই টাকা দিতে না পেরে বেশি করে জল বিক্রি করার পথে যাবে এবং জলের দামের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটাবে। একথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে, এই জল কিনতে বাধ্য হবে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রচাষী। এর ফলে তাদের চাষের খরচ বাড়বে, অথচ ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হবে তারাই। ফলে জড়িয়ে পড়বে ঋণের জালে। এর অনিবার্য ফল হবে, ক্ষুদ্র ও গরিব চাষী জমি বিক্রি করে ভিক্ষুকে পরিণত হবে, না হয় বর্ধমানের ফড়িং সর্দারের মতো আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করবে। এই দুঃখজনক পরিণতির জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে অবিলম্বে কৃষিতে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে এস ইউ সি আই ও অ্যাবেকা।

২০০৫-০৬ সালের মাশুল ঘোষণায় চালাকির আশ্রয় নিয়ে দেখানো হয়েছে যেন ক্ষুদ্র শিল্পের মাশুল কমানো হল। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে নূতন করে মাসে এইচ পি পিছু ১০ টাকা

সাতের পাতায় দেখুন

পানকে কৃষিপণ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে মেদিনীপুরে চাষীদের দাবি

পান পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক ১৯,১৪৮ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। রাজ্যের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সর্বোচ্চ ৬৪১০ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। জেলায় প্রায় লক্ষাধিক পরিবার এই চাষ ও বিপণনের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও পান আজও অর্থকরী ফসল হিসাবে সরকার স্বীকৃত নয়। জেলায় নেই কোন পানের গবেষণাগার, নেই পানের ভেষজগুণকে কাজে লাগিয়ে সুগন্ধী বা ঔষধ প্রভৃতি তৈরির কোন পরিকল্পনা। এর উপর সম্প্রতি বেশ কিছুদিন বাজারে পানের ন্যায্য দাম না থাকায় চাষীরা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। গত বছর এই সময় বড় সাইজ ১০ হাজার পানের দাম ছিল ১৬০০ - ১৮০০ টাকা। বর্তমানে এই পান বিক্রি হচ্ছে ৫০০-৬০০ টাকায়। মাঝারি সাইজের পানের দাম ৮০০-১০০০ টাকার জায়গায় ৩০০-৪০০ টাকা, ছোট পানের দাম ৩০০-৪০০ টাকার স্থানে হয়েছে ৫০-৬০ টাকা। ফলস্বরূপ পান বিক্রি করে চাষের খরচটুকুও উঠছে না। ইতিমধ্যে নদীয়া ও হাওড়া জেলায় কয়েকজন চাষী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। উপরোক্ত সমস্যার পাশাপাশি রেল দপ্তর বিভিন্ন রাজ্যে পান পাঠানোর ব্যাপারে যে ভায়া বুকিং পদ্ধতি চালু করেছে তাতে পান বাইরে পাঠানোর খরচ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি নিয়ে মেদিনীপুর জেলা পান চাষী সমন্বয় সমিতির ডাকে ৫ জুলাই প্রায় পাঁচ শতাধিক পান চাষী প্রতীকী পানের মোট মাথায় নিয়ে জেলা শাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং জেলা শাসক ও জেলা হর্টিকালচার আধিকারিকের অফিসে স্মারকলিপি দেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি আশুতোষ সামন্ত, সম্পাদক সূর্য জানা, মন্মথ দাস, গোষ্ঠ কুইল্যা, সন্তোষ সী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জেলা শাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) এবং হর্টিকালচার দপ্তরের জেলা আধিকারিক স্মারকলিপি নেন।

হাইকোর্টের রায়ে স্থগিত ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অগণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ নির্বাচন

মেডিকেল কলেজগুলির কর্তৃপক্ষ যে নির্লজ্জভাবে এস এফ আই-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে, পুনরায় তার প্রমাণ মিলল কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

এপ্রিল-মে মাসে পরীক্ষার চাপ না থাকায় সংবিধান অনুযায়ী ঐ সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ বছর মার্চ, এপ্রিল, মে মাস ধরে কলেজের একমাত্র বিরোধী ছাত্র সংগঠন হিসাবে ডি এস ও'র পক্ষ থেকে অধ্যক্ষার কাছে বারংবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংবিধানকে অস্বীকার করে এস এফ আইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্র সংসদে বসিয়ে দেওয়ার জন্য ২ জুলাই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে যখন কলেজের চারটি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের পরীক্ষা চলছে।

এই অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডি এস ও'র পক্ষ থেকে আন্দোলনের পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টে এই নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য মামলা দায়ের করা হয়। একই সঙ্গে এস এফ আইকেও আহ্বান জানানো হয় ছাত্র সংগঠন হিসাবে কর্তৃপক্ষের এই অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে, যা প্রত্যাখ্যান করে এস এফ আই কর্তৃপক্ষের সাথে নিজেদের অশুভ আঁতাত ছাত্রমহলে স্পষ্ট করে তোলে।

গত ৩০ জুন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অসীম ব্যানার্জী কর্তৃপক্ষকে তিরস্কার করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন ও পরে সমস্ত ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনের দিন ঘোষণার নির্দেশ দেন।

এ আই ডি এস ও'র ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ইউনিটের পক্ষে কমরেড পুলকেন্দু ঘোষ এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'হাইকোর্টের এই রায় ছাত্র আন্দোলনের নৈতিক জয়কেই প্রতিফলিত করেছে।'

নদীয়া

কালীগঞ্জ ব্লকে কৃষক ও খেতমজুরদের বিক্ষোভ

গরিব মানুষের দৈনিক কাজ, ফসলের ন্যায্য দাম, সমস্ত গরিবের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, নয়া পঞ্চায়েতী ট্যাক্স বাতিল, কৃষিঋণ মকুব, কৃষি কাজে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, পঞ্চায়েতী দুর্নীতি বন্ধ করা ইত্যাদি দাবিতে গত ২৬ জুন তিন শতাধিক কৃষক ও খেতমজুরের সুসজ্জিত মিছিল দেবগ্রাম বাজার পরিক্রমা করে উপস্থিত হয় বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে। সংগঠনের পক্ষ থেকে কমরেড হররোজ আলি ও মহিউদ্দিন মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিডিওর হাতে স্মারকলিপি পেশ করেন। আলোচনায় বিডিও সমস্ত দাবিগুলির প্রতি নৈতিক সমর্থন জানান এবং দেবগ্রাম অঞ্চলের ভাগগ্রামে এবং পলাশী ২নং অঞ্চলের ভুরুলিয়া গ্রামে সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির রাস্তা তৈরির কাজে দুর্নীতির উপযুক্ত তদন্ত করবেন বলে আশ্বাস দেন। বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কে কে এম এস জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জগন্নাথ ঘোষ, এস ইউ সি আই কালীগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড কামালউদ্দিন এবং কে কে এম এস নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখ। একই দাবিতে ২৮ জুন তেহট্ট ২ ব্লক অফিসেও কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা

বারাসাতে সেভ এডুকেশন কনভেনশন

প্রবল দুর্যোগকে উপেক্ষা করে গত ৩ জুলাই বারাসাতে সুভাষ ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় জেলা সেভ এডুকেশন কনভেনশন। কনভেনশনে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় দুইশত শিক্ষানুরাগী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন বেড়াচাঁপা হাইস্কুলের শিক্ষক সঞ্জয় ঘোষ। বক্তব্য রাখেন কাজীপাড়া হাইস্কুলের সহপ্রধান শিক্ষক গোপাল মণ্ডল, শিক্ষক লোকমান হাকিম, তপতী রায় প্রমুখ। সভায় প্রধান বক্তা সেভ এডুকেশন কমিটির পঃ বঃ রাজ্য কমিটির সদস্য অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করছে, এদের লক্ষ্য মানুষকে অমানুষে পরিণত করা, যাতে সর্বব্যাপী পুঁজিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন জেলার প্রাক্তন কৃষি আধিকারিক দুলাল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, উচ্চবিত্তদের জন্য এক ধরনের এবং বিত্তহীনদের জন্য ভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সরকার গড়ে তুলতে চাইছে। কনভেনশন থেকে জেলার বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা দেবপ্রসাদ ভঞ্জচৌধুরীকে সভাপতি এবং সঞ্জয় ঘোষকে সম্পাদক করে ২৬ জনের জেলা সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

হাবড়ায় খেতমজুর আন্দোলনের জয়

১০০ দিনের কাজ ও পরিচয়পত্রের দাবিতে গত ২৯ জুন হাবড়ায় এ আই কে কে এম এসের নেতৃত্বে খেতমজুররা কুমড়া পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করেন। দুই শতাধিক খেতমজুর তাঁদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন কুমড়া পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে। এই প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন জেলা কে কে এম এসের সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। ২০০ জন খেতমজুরের পরিচয়পত্রের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ নামের তালিকা পঞ্চায়েতে জমা দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত প্রধান তালিকা গ্রহণ করে বলতে বাধ্য হন যে এই পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে আগামী দিনে পঞ্চায়েতের কাজ হবে। এছাড়াও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যে সমস্ত খেতমজুররা এখনও পরিচয়পত্র পাননি তাদের অতিদ্রুত তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

নদীয়া

ধোড়াদহ ২নং পঞ্চায়েতে এ আই কে কে এম এস-এর দাবি আদায়

খেতমজুর ও গরিব চাষীদের বিভিন্ন দাবিতে এবং সালিশি বোর্ড, নারী পাচার, জীবনশৈলীর নামে যৌনশিক্ষা প্রচলনের বিরুদ্ধে এ আই কে কে এম এসের করিমপুর ১নং লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড আব্বাস আলি সেখ-এর নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধিদল পঞ্চায়েত প্রধানকে গত ২৭ জুন ডেপুটেশন দেয়। সেখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ জেকের আলি সেখ, দুখীরাম মহলদার, সাব্বীর আহম্মেদ, মসিকুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের নেতা কমরেড আব্বাস আলি জানান যে, পঞ্চায়েত প্রধান খেতমজুরদের পরিচয়পত্র দেওয়ার এবং তাঁর এলাকায় মদের দোকান খুলতে না দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য দাবিগুলিও পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

পঞ্চায়েতে ডেপুটেশনের পর দোগাছী হাটে পেট্রল, ডিজেল-এর মূল্যবৃদ্ধি এবং বাসের ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদে পথসভা হয়।

জেলায় জেলায় ডি ওয়াই ও প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

ব্যাজ পরিধান, যুবসভা, পথসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ২৬ জুন জেলায় জেলায় এ আই ডি ওয়াই ও'র ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জে সকালে শহীদ বেদীতে মাল্যদান, দাবি সম্বলিত ব্যাজ পরিধানের পর বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত যুবক-যুবতীদের সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড বিপ্লব কর্মকার, জেলা সভাপতি কমরেড গোপাল ঘোষ, জেলা কোষাধ্যক্ষ কমরেড তপন দাস এবং এস ইউ সি আই জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কমল দে।

মুর্শিদাবাদ ঃ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৭ জুন হরিহরপাড়া কমিউনিটি হলে যুবসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর, জেলা সভাপতি কমরেড কৌশিক চ্যাটার্জী ও জেলা সম্পাদক কমরেড গোলাম আম্বিয়া। সভার পরে এক যুব মিছিল হরিহরপাড়া বাজার পরিক্রমা করে এবং মদের প্রতীকী বোতল পোড়ানো হয়। বহরমপুর, রানিনগর, লোচনপুর, সাগরদিঘী এবং ডোমকলেও যুবসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁকুড়া ঃ ধলডাঙা মোড়ে দাবি ব্যাজ পরানো হয় এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কর্মী কমরেড নিতাই শীট ও জেলা ইনচার্জ কমরেড দিলীপ কুণ্ডু। চিঙ্গানী, জগদল্লা ও সিমলাপালের ধাদকিডাঙায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হুগলি ঃ রিষড়ায় আলোচনা সভা এবং সিঙ্গুর স্টেশনে ব্যাজ পরিধান অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমান ঃ কাটোয়া ইউনিটের পক্ষ থেকে পতাকা উত্তোলন ও সারাদিন ব্যাজ পরিধান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন ইউনিটের পক্ষ থেকে পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং 'গণআন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে' কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের টেপ শোনানো হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ ৩০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে লক্ষ্মীকান্তপুরে এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তিন শতাধিক যুবক-যুবতীসহ পাঁচ শতাধিক মানুষের এই সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরী। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড শ্যামল প্রামাণিক, এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড আনসার শেখ ও কমরেড ইউসুফ মোল্লা।

রাষ্ট্রের খরচে নির্বাচন

সংসদে জনতার কথা পৌঁছানোর পথ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা

কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ভারতের সংসদীয় নির্বাচন সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দুর্নীতি আটকাবার উদ্দেশ্যে আলোচ্য বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করে তার ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে পরস্পর মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি মনে করেন, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির অর্থসাহায্য পাওয়া এবং তা খরচ করার ব্যাপারটিতে স্বচ্ছতা আনতে, আলোচ্য বিষয়ের এই তালিকায় রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচনের বিষয়টিও অবশ্য রাখা দরকার। জাতীয় স্তরে মতামতের ভিত্তিতে এই বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ''আমাদের দেশে কালো টাকা সৃষ্টি হওয়ার একটি প্রধান উৎস হল রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া অর্থসাহায্য এবং কোন রাজনৈতিক দলই নিজের চেষ্টায় এককভাবে এই সমস্যাকে মোকাবিলা করার কথা বলতে পারে না।''

সাংবাদিক বৈঠকের ওই স্বল্প সময়ে প্রধানমন্ত্রী যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি, বা বলা ভাল, দেননি, সেগুলি হল — রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া অর্থ কালোটাকার একটি প্রধান উৎস হয়ে উঠল কেন? কেনই বা কোনও রাজনৈতিক দলই এককভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করার কথা বলতে পারে না? তাহলে কি এই সমস্যার কারণ বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত নয়? এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে প্রধানমন্ত্রী কী কী ব্যবস্থা নিতে চান? অনুচ্চারিত এই প্রশ্নগুলি নিয়েই এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব।

রাষ্ট্রের খরচে নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য ১৯৯৮ সালের জুন মাসে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের আমলে সিপিআই-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে সভাপতি করে একটি বহুদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটিতে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, শিবসেনা, এ আই এ ডি এম কে এবং জনতা পার্টির সদস্যরাও ছিলেন। একমাত্র সরকার স্বীকৃত জাতীয় কিংবা রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক দলগুলিকে ও তাদের নির্বাচনী প্রার্থীদের আংশিক রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়ার সুপারিশ করেছিল এই কমিটি। কমিটি আরও বলেছিল, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলগুলির সমস্ত বৈধ খরচই রাষ্ট্র বহন করবে — এই তাদের লক্ষ্য। এর অর্থ হচ্ছে, সুপারিশগুলি কার্যকরী হলে বাস্তবে যারা সুপারিশকারী তারাই এর সুফলগুলি ভোগ করবে (ফ্রন্টলাইন, ১৩-২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ সংখ্যা)।

রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচন চালাবার উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সাংগঠনিক কাজকর্ম বা রাজনৈতিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে, কিংবা নির্বাচনী প্রচার চালাতে ব্যক্তিগত দাতাদের কাছ থেকে সদস্য চাঁদা হিসাবে সামান্য টাকা ছাড়া অন্য কোনও অর্থ সাহায্য নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। রাষ্ট্রীয় সাহায্য বলতে কমিটির সুপারিশ ছিল — কেন্দ্রীয় অফিস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য জাতীয় দলগুলির ক্ষেত্রে দিল্লিতে এবং প্রতিটি স্বীকৃত আঞ্চলিক পার্টির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির রাজধানী শহরে বিনা-ভাড়ায় ঘরের ব্যবস্থা করা; ওই অফিসগুলিতে নিয়মিত এবং আলাদাভাবে নির্বাচনের সময়ে প্রচারকার্যে ব্যবহার করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে অন্যান্য সুযোগসুবিধা সহ বিনাভাড়ায় টেলিফোন ব্যবহার করতে দেওয়া — এই টেলিফোনগুলিতে মাশুলবিহীন 'কল'-এর সংখ্যা সাধারণের তুলনায় বেশি থাকবে; বিনাপয়সায় 'দূরদর্শন' ও 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'তে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারের সুযোগ করে দেওয়া; প্রচারগাড়িতে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রল ও ডিজেলসহ পোস্টার ও নানা ধরনের নির্বাচনের পত্রপত্রিকা, প্রচারপত্র এবং ভোটার পরিচয়পত্র ছাপানোর জন্য কাগজ এবং এই ধরনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ইত্যাদি। নির্বাচনী 'ফান্ড' হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৬০০ কোটি টাকা এবং সমস্ত রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক মিলিতভাবে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য দেবার সুপারিশও করেছিল কমিটি।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া আজ যে জঘন্য অবস্থায় পৌঁছে গেছে তাতে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া অন্যান্য সুপারিশগুলির সাথে রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচন চালানোর দ্বারা তার কোনও সুরাহা হওয়া সম্ভব কিনা — সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচন চালানোর বিষয়টির দিকেই যদিও আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে, তবুও আমরা মনে করি, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরো মসৃণ ও উন্নত করার নামে যে সমস্ত সুপারিশ করা হচ্ছে সেগুলি প্রয়োগ করা হলে, কীভাবে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী প্রকৃত শক্তি — যারা একমাত্র মানুষের স্বার্থরক্ষার অভিন্ন উদ্দেশ্যে লড়াই করে, সেই শক্তির সংসদীয় ফোরামে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধারই সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতে পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অবনমন ঘটার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচনী সংস্কারের প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী সর্বদাই নির্বাচনের বিষয়টিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজেদের স্বার্থ পূরণের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। যে রাজনৈতিক শক্তি সবচেয়ে ভালভাবে তাদের সেবা করার এবং পুঁজিবাদী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে সেই শক্তিই যাতে নির্বাচনে জিতে সরকারি গদিতে বসতে পারে সে বিষয়ে পুঁজিপতিরা নিশ্চিত হতে চেয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পুঁজিপতিশ্রেণীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে ক্ষমতাসীন হয়েছিল যে কংগ্রেস, স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালনের উত্তরাধিকার হিসাবে সেই সময়ে তার পিছনে জনগণের সমর্থনও ছিল। সেসময় নির্বাচনী প্রক্রিয়া সহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র সীমিতভাবে হলেও আপেক্ষিক অর্থে অবাধ ও পরিচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একচেটে পুঁজিপতিদের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে পুঁজিবাদের সঙ্কট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বুর্জোয়া দল ও তাদের জোটগুলি, যারা একের পর এক ক্ষমতায় বসেছে, ক্রমাগত আস্থা হারিয়ে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। গণতন্ত্রের প্রতি কোনরকম দায়বদ্ধতাই আজ আর তাদের নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ক্রমে ক্রমে অলীক কল্পনায় পরিণত হয়েছে। ভোটার লিস্টে অবাধ কারচুপি, ফল্‌স্ ভোটিং, বিশেষত অশিক্ষিত ও দরিদ্র ভোটারদের নানা ধরনের সুযোগসুবিধা বিতরণের মাধ্যমে অথবা ভয় দেখিয়ে বিশেষ দলকে ভোট দিতে বাধ্য করা, ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তোলা, সংবাদমাধ্যমে ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে পছন্দের দলগুলিকে অন্যায় সুযোগ সুবিধা দেওয়া, ইত্যাদি কারণে নির্বাচন ক্রমেই প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিতেও পচন আরও তীব্র হচ্ছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র দখলের মাধ্যমে অবাধ রিগিং, ব্যালট বাক্সে এবং ভোট গণনার সময়ে কারচুপি ইত্যাদি দুষ্কর্ম মারাত্মক আকারে সারা দেশ জুড়েই চলছে; এমনকী সিপিআই(এম)-এর মতো তথাকথিত বামপন্থী দল শাসিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। যেভাবে সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়াই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পচে-গলে বিকৃত রূপ নিচ্ছে, তাতে যারা জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি তাদের পক্ষে নির্বাচনী যুদ্ধে জিতে সংসদের আসনে বসা বস্তুতপক্ষেই ক্রমাগত অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এইভাবে, গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকারের পক্ষে জোরালো এবং চমকদার স্লোগান দিতে দিতেই পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভোট দেওয়ার অধিকারটিকেই বাস্তবিক পক্ষে কেড়ে নিচ্ছে। গত বছরের চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনটি পচে যাওয়া এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ারই ঘৃণ্যতম নজির।

ফলে, নির্বাচন এখন একচেটে পুঁজিপতিদের উদ্যোগে ও নিয়ন্ত্রণে স্রেফ অর্থ, মাফিয়া এবং বেশিরভাগ প্রভাবশালী প্রচারমাধ্যমের যৌথ ক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। এটা কোনমতেই আর জনগণের অংশগ্রহণ ও মতের প্রতিফলন নয়। কংগ্রেস, বিজেপির মতো বৃহৎ রাজনৈতিক দলই হোক, বা এই ধরনের অন্যান্য আঞ্চলিক দল হোক, বা সিপিএম-সিপিআই-এর মতো তথাকথিত বামদলই হোক, এরা কেউই নির্যাতিত মানুষের যন্ত্রণা নিয়ে, বা প্রকৃত জনস্বার্থের পরিপূরক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কোনও বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না; এরা সকলেই শুধুমাত্র ক্ষমতার সাথে যুক্ত মধুভাণ্ডের লোভে ক্ষমতায় যাওয়ার ইঁদুর দৌড়ে মত্ত। ক্ষমতায় বসার প্রয়োজনে যেকোন রকম জোটে যেকোন সময় এরা সামিল হতে পারে। গতকাল যে ছিল চরম শত্রু, গদি দখলের বাসনায় আজ সে পরম মিত্র বনে যেতে পারে; একসময় যে ছিল ভোট যুদ্ধের বিশ্বস্ত সেনানায়ক, আজ প্রবল শত্রু হিসাবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে এরা। কাল যাকে মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, আজ তাকেই তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে উষ্ণ স্বাগত জানানো যেতে পারে। যে সমস্ত মাফিয়া ডন একসময় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির ভাড়াটে বাহিনী হিসাবে কাজ করত, তারাই এখন সেইসব দলে নেতার পদে বসছে। সাধারণ মানুষ ভোটের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেও প্রচারমাধ্যমগুলি পরিকল্পিতভাবে ভোটের পক্ষে হাওয়া তুলতে সাহায্য করছে। যে একচেটিয়া পরিবার বা জোটের হয়ে তারা কাজ করে তাদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনগণের বিশ্বাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তারা প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশ করে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি মেলে না।

সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হল নির্বাচনগুলিতে টাকার স্রোত বয়ে চলা। জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিটি সংসদীয় দলই নির্বাচন উপলক্ষে বিপুল অর্থব্যয়ে প্রচারের যে বন্যা বইয়ে দেয় তার কাছে সংসদের আসন-পিছু ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য বেঁধে দেওয়া নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। স্বভাবতই নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেরা যে বিপুল খরচ করে, সেটি কিন্তু নির্ধারিত এই ঊর্ধ্বসীমার থেকে অনেক অনেক বেশি। ফলে এক্ষেত্রে আইনের ফাঁক গলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে কালো টাকা সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

মানুষকে যে প্রশ্নটি নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, সেটি হল, সমাজের সর্বব্যাপক সঙ্কটের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে যে রাজনৈতিক দলগুলি ন্যূনতম সহায়তা করছে না, সেই দলগুলিকে নির্বাচনে জয়ী করতে এই বিপুল অর্থ কেন ব্যয় করা হচ্ছে এবং কারাই বা এই অপরিসীম অর্থের জোগানদার। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্টভাবে মানুষের জানা থাকলেও এ সত্য তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয় যে, এইটিই হল ছোট বা বড় — প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য। পুরাতন পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকাই হোক, কিংবা প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া নতুন পুঁজিবাদী দেশ রাশিয়াই হোক্ — প্রতিটি দেশেই পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সাধারণ সঙ্কটের সাথে সাথে সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থাটিও চূড়ান্তভাবে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্রের স্বঘোষিত 'চ্যাম্পিয়ন' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত দু'বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা এখনও মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি — যেগুলির মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার এই চূড়ান্ত অধঃপতিত চেহারা সকলের নজরে এসেছিল।

বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের একেবারে শুরু থেকেই নির্বাচন শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে তাদের পছন্দমত দল ও শক্তিগুলিকে ক্ষমতায় বসাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সব সময়ই সংসদীয় ব্যবস্থা বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের সাথে যুক্ত থেকেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্থানের যুগে যখন তা ছিল এক বিকাশশীল শক্তি, সেইসময়ে জনসাধারণকে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সহ আপেক্ষিক অর্থে তা উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ দিতে পেরেছে, শাসকশ্রেণী তাদের পছন্দমত দল বা শক্তিকে জিতিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পেরেছে। কিন্তু যতই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়েছে, ততই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলিকেও শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও শ্রেণীশাসনকে বজায় রাখতেই নানা জনবিরোধী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। ফলে তারা ক্রমাগতই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী জনগণের রাগ ও ঘৃণার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এইরকম একটা অবস্থায় যাতে কোনওভাবেই জনগণের স্বার্থবাহী কোনও দল ক্ষমতায় না যেতে পারে তার জন্য শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে আর কোনও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।

ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র বা নির্বাচনী প্রক্রিয়া আজ শুধুমাত্র বাইরের ঠাটবাটের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা জনগণকে গেলানো হচ্ছে। যাদের অঢেল টাকা আছে, ক্রয়ক্ষমতা আছে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণও আজ তাদেরই হাতে। আর সেই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ এবং তার কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। অর্থাৎ, সংসদীয় গণতন্ত্রের যে বাহ্যিক রূপটি আজও বজায় আছে, তার মধ্যে আজ আর প্রকৃত গণতান্ত্রিক সত্তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। সমস্ত ব্যবস্থাটির সারবস্তুও দাঁড়িয়েছে আজ এইটুকুই যে, নির্বাচনী ডামাডোলের মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণীর আস্থাভাজন যুযুধান বিভিন্ন দল বা জোটের মধ্য থেকে সুবিধামত কোন একটিকে জিতিয়ে আনতে হবে, যাতে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ সবচেয়ে ভালভাবে রক্ষিত হয় ও শ্রেণীশোষণ এবং শাসন সবচেয়ে ভালভাবে বজায় থাকে। সেখানে কোন্ দলের কী রং, কী তাদের রাজনৈতিক বুলি, বা কোন্ জায়গায় তারা পরস্পরের থেকে কতটা আলাদা, এসব কোনও কিছুরই কোন মূল্য নেই। কোনও দল শাসকশ্রেণীর স্বার্থে কতটা নিবেদিতপ্রাণ এবং সেই বিশেষ মুহূর্তে কার দ্বারা শাসকশ্রেণীর স্বার্থ সর্বোত্তমভাবে রক্ষিত হবে, এখানে একমাত্র বিবেচ্য সেইটুকুই। এর উপরই নির্ভর করে নির্বাচনে জিতে কোন্ দল বা জোট ক্ষমতায় আসীন হবে। এমনকী বিভিন্ন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনী দ্বন্দ্বও যে বাস্তবে আজ সেইসব দ্বন্দ্বের আড়ালে

ছয়ের পাতায় দেখুন

হুল-এর ১৫০ বৎসর উদ্‌যাপন উপলক্ষে দাবি

সাঁওতাল বিদ্রোহের সঠিক ইতিহাস ও যথার্থ মূল্যায়ন চাই

কলকাতা

'হুল'-এর ১৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে গত ৩০ জুন কলকাতার সিধু-কানু ডহরে এবং ২-৩ জুলাই বীরভূমের জেলা শহর সিউড়িতে 'হুল'-এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান হয়। ৩০ জুন সকাল ৮টায় সিধু-কানু ডহরের সভায় সভাপতিত্ব করেন 'হুল'-এর ১৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির কলকাতা জেলা শাখার সভাপতি শ্রী বর্জুরাম সিং সর্দার। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, দীপঙ্কর রায়, বর্জুরাম সিং সর্দার সিধু-কানুর নামাঙ্কিত স্মৃতিফলকে মাল্যদান করেন। অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ের অমানবিক অত্যাচারের কথা বলে বর্তমানেও কীভাবে আদিবাসী জনগণসহ সকল অংশের গরিব মানুষ শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মহাশ্বেতা দেবী সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর বিভিন্ন দিক এবং সিধু-কানু ডহরের নামকরণ ও স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেন। দীপঙ্কর রায় বলেন, সাঁওতাল সহ আদিবাসী গরিব মানুষের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার যুগ যুগ ধরে হয়েছে, সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ববর্তী সময়ে ব্রিটিশ সমর্থনপুষ্ট উচ্চবর্ণের হিন্দু সুদখোর-মহাজনদের যে অবর্ণনীয় অত্যাচার সাঁওতাল জনগণকে সহ্য করতে হয়েছে তার বিরুদ্ধেই ছিল বিদ্রোহ বা হুল। তিনি আরও বলেন যে, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকেই আমরা সাঁওতাল জনগণের আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়নের ও বীর শহীদদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পথ খুঁজে পেয়েছি।

বীরভূম

বীরভূম জেলার সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে ২ জুলাই দুপুর ২টায় এক সভার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক। সভাপতিত্ব করেন 'হুল'-এর ১৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির বীরভূম জেলা শাখার সভাপতি মঙ্গল হেমব্রম। সাঁওতালি গান ও নাচের মধ্য দিয়ে সিধু-কানু ও হুল-এর শত শত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে 'হুল' স্মরণে একটি স্মৃতিফলক স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বৃষ্টির মধ্যেও সমাবেশের শৃঙ্খলা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। ঐদিন বিকাল ৫টায় সিউড়ির রবীন্দ্রসদনে এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, 'জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে আদিবাসীদের সংযুক্তিকরণের সমস্যা'। দ্বিতীয় দিন ৩ জুলাই বিকাল ৫টায় 'হুল'-এর শিক্ষা ও আমাদের কর্তব্য' এই বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। আলোচনা করেন গোপাল কুণ্ডু, তরুণ চৌধুরী, সারদা প্রসাদ কিস্কু, সৌমেন বসু, অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক, বিসম্বর মুড়া প্রমুখ। ৩ জুলাই সকাল ১০টা থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় এবং বিকালে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন জেলা থেকেও বহু উৎসাহী মানুষ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। 'হুল'-এর দেড়শ বছর পূর্তিতে কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবি পেশ করা হয়েছে—

১। 'হুল' সহ সমস্ত আদিবাসী বিদ্রোহের সঠিক ইতিহাস রচনা ও তার মূল্যায়ন করতে হবে;
২। স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রমে আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
৩। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে সিধু-কানু সহ সমস্ত শহীদের নামে রাস্তার নামকরণ করতে হবে এবং
৪। সিধু-কানু ও বিরসা মুণ্ডার মূর্তি স্থাপন করতে হবে।

বর্ধমানে হুল দিবস

৩০ জুন এস ইউ সি আই-এর ইছাপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে কামারহিড় গ্রামে সাঁওতাল গণসংগ্রামের 'হুল' দিবস পালিত হয়। গণসংগ্রামের নেতা সিধু-কানুর ছবিতে মাল্যদান করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু ও বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ভাস্কর রায়চৌধুরী। হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তার গুরুত্ব ও নীতিনৈতিকতার দিকটি ব্যাখ্যা করেন কমরেড গোপাল কুণ্ডু। সভা পরিচালনা করেন কমরেড নুরুল সোরেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়। অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম থেকে সহস্রাধিক নারী-পুরুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ঝাড়খণ্ড

সিংভূমে হুল দিবস

সিধু-কানুর নেতৃত্বে গণসংগ্রাম — 'হুল'-এর ১৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সিংভূম জেলাব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডুমুরিয়াতে পাঁচ শতাধিক আদিবাসী শ্রোতার মাঝে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সীতারাম টুডু বলেন — ''সিধু-কানুর সংগ্রাম ছিল শোষণমুক্তির সংগ্রাম। জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তৎকালীন অত্যাচারী জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের নজির তাঁরা রেখে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় বিরল।' এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেড কমল মান্না।

জামশেদপুরের সাকচী ও আদিত্যপুরে পার্টির উদ্যোগে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সকাল থেকে সিধু-কানুর নামাঙ্কিত ব্যাজ পরিধান ও সংগ্রাম তহবিলে অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়া পার্টি প্রকাশিত সিধু-কানুর জীবনীমূলক বই বিক্রি করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ বিজন দাস, লিলি দাস, সুমিত রায়, রাজকুমার সর্দার, বিনয় লোহার, অশোক গুপ্ত, পল্লব বিশ্বাস প্রমুখ।

এছাড়া জামশেদপুরের এক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা বেলডিহ বস্তিতেও সিধু-কানু দিশা সমিতির উদ্যোগে এক অনুষ্ঠান হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজয় মাঝি বলেন — ''স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও আদিবাসীদের জীবনের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক মনে করে। আজও ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী ভাষায় শিক্ষার কোনো সুবিধা নেই। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে অর্জিত 'ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট'কে শিথিল করে দেওয়া হচ্ছে এবং আদিবাসী ও অন্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।''

সভায় সিধু-কানুর ওপর গান পরিবেশন করেন পাণ্ডু হাঁসদা ও দুঃখী বাস্কে। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন অমিত রায়, সুরেশ নায়েক প্রমুখ।

চতুর্থ শ্রেণীতে সরকারি পরীক্ষা চালু হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা চালানো হবে কি?

ব্যাপক জনমত গ্রহণের উদ্যোগ

রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার মানের অবনমনে এ রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক স্তরে পুনরায় ইংরেজি শিক্ষা ফিরে এলেও আজ পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি পরীক্ষা (বৃত্তি সহ প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা) চালু হয়নি। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ আকর্ষণহীন হয়ে পড়ছে। ৪/৫ বছর ধরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া সত্ত্বেও পাশ-ফেল প্রথা সহ সুষ্ঠু পরীক্ষাব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা প্রায় কিছুই শিখছে না — এ তথ্য বারংবার বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের দেশে শিক্ষার এহেন পরিণতিতে সকলেই গভীরভাবে মর্মাহত।

শিক্ষাকে সামগ্রিক অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পরিচালনায় বেসরকারিভাবে বৃত্তি পরীক্ষা চলছে। ১৯৯২ সালে ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী দিয়ে যে পরীক্ষার সূচনা হয়েছিল তা ক্রমাগত জনপ্রিয় হতে হতে বর্তমানে সওয়া তিন লক্ষে এসে পৌঁছেছে। অধঃপতিত শিক্ষার মানকে কিছুটা হলেও প্রতিহত করে শিক্ষায় আবার নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এই বেসরকারি পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সাধারণ মানুষ ব্যাপক সমর্থন করলেও এই পরীক্ষার জনপ্রিয়তা সরকারকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। তাই তারা ইতিপূর্বে বিভিন্নভাবে বিরুদ্ধতা করেও বন্ধ করতে না পেরে এ বছর হঠাৎ করে ৪র্থ শ্রেণীতে একটি পরীক্ষা শুরু করেছে। নাম দেওয়া হয়েছে ডায়গনস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট। এতে না আছে পাশ-ফেল প্রথা, না আছে বৃত্তিদানের কোন ব্যবস্থা। এমনকী বৃত্তি পরীক্ষাও নামকরণ করলেন না। এছাড়া অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা নেই উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদানের। বহু জায়গায় বিশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষা হয়েছে। এমনকী বহু জায়গায় খাতা দেখাও হয়নি। সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে লোকদেখানো একটি পরীক্ষা চালু করছেন — যা কার্যত শিক্ষার কোন উন্নতি ঘটাবে না।

এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা আগামী দিনেও চালান হবে কিনা তা ঠিক হবে জনমতের ভিত্তিতে। প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতামত জানতে পর্ষদ আগ্রহী। এই উদ্দেশ্যে ব্যাপক জনমত গ্রহণের জন্য পর্ষদের তরফে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। পর্ষদ নির্ধারিত ফরমে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান হয়েছে।

নামখানায় বেআইনি ভাড়াবৃদ্ধি

প্রতিবাদে 'পরিবহন যাত্রী কমিটি' গঠিত

সরকার বাসমালিকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই বাসের ভাড়া বাড়ায়। কিন্তু ভাড়াবৃদ্ধির সেই সরকারি নিয়মকেও লঙ্ঘন করে আর টি এ-র সঙ্গে যোগসাজসে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা-বকখালি রুটের বাসমালিকেরা অতিরিক্ত ভাড়াবৃদ্ধির তালিকা জারি করে দিয়েছিল বাসে বাসে। বাসমালিকদের এই চাতুরি জনসমক্ষে তুলে ধরে এস ইউ সি আই-এর নামখানা লোকাল কমিটি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আহ্বান জানায়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে জনসাধারণ। রাস্তা অবরোধের কর্মসূচিও পালিত হয়। জনসাধারণের সংগ্রামী মানসিকতা বুঝে সিপিএমও একদিনের রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। অবশেষে পুলিশ-প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাসমালিকরা ঐ বর্ধিত ভাড়া তালিকা আপাতত প্রত্যাহার করে নেয়।

গত ১৯ জুন নামখানা বাজারে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা পরিবহন যাত্রী কমিটির সম্পাদক সদানন্দ বাগল, নামখানা নাগরিক কমিটির সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ প্রধান, অ্যাবেকার নামখানা শাখার শরৎ বারিক, নামখানা নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সুকুমার গিরি এবং বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির হিমাংশু শেখর আদক। আলোচনা শেষে ১২টি ক্লাবের প্রতিনিধি সহ মোট ৬২ জনের 'নামখানা থানা পরিবহন যাত্রী কমিটি' গঠিত হয়েছে এবং দেবেন্দ্রনাথ প্রধান তার সভাপতি, কমলেন্দু পানি সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। বিভিন্ন বাসস্টপে বাসযাত্রীদের নিয়ে নবগঠিত কমিটির শাখা গড়ে তোলার কর্মসূচি কনভেনশন থেকে গৃহীত হয়েছে।

বসিরহাটে রাজ্য যুব শিবির

এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ৬-৭ জুলাই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে দেড়শতাধিক যুব কর্মীকে নিয়ে এক যুব শিবির অনুষ্ঠিত হল উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট টাউন হলে। ৬ জুলাই সন্ধ্যায় বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা গান, আবৃত্তি, মূকাভিনয় এবং যুবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাৎক্ষণিক নাটক প্রদর্শন করেন। ৭ জুলাই যুব আন্দোলনের সমস্যা নিয়ে মতামত দেন উপস্থিত যুবকর্মীরা। সমাপ্তি অধিবেশনে যুব কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায়। কমরেড রায় বলেন, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসাই যুগে যুগে বিপ্লবীদের সমাজ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজও নিজেদের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত হল মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা। তিনি ব্যক্তিবাদের সমস্ত রকম কুপ্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসার জন্য উপস্থিত যুবকর্মীদের কাছে আহ্বান জানান। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ ও সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার। শিবির থেকে দীর্ঘস্থায়ী যুব আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বাঁকুড়া

খাতড়া মহকুমা হাসপাতাল চালুর দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ

দীর্ঘদিন যাবৎ খাতড়া মহকুমা হাসপাতালের নতুন ভবন নির্মিত হলেও তা চালু না হওয়ায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। এই ক্ষোভকে আন্দোলনের রূপ দিতে এগিয়ে আসেন স্থানীয় চিকিৎসক, আইনজীবী এবং নাগরিকেরা। ২১ মে খাতড়া শহরের দাসের মোড়ে এক বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট বক্তারা দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর আকারে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির ফলে সোভিয়েটবিরোধী পশ্চিমী ফ্রন্ট মাথা তুলতে পারেনি

(মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরও ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

পঞ্চম পর্ব

প্রাথমিক আচমকা আক্রমণে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী সোভিয়েটের প্রতিরোধ ভেঙে দ্রুত ভিতরে ঢুকে যায়। শত্রুরা সোভিয়েটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো দখল করে নেয় এবং বেশ কিছু সামরিক জেলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অচল করে দেয়। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট জনগণ এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ জার্মান বাহিনীর দখলে চলে যায়।

অনাক্রমণ চুক্তির প্রতি স্ট্যালিন মোহগ্রস্ত ছিলেন না

কেন এটা ঘটতে পারল? স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর অনেকে এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছিলেন যে, সোভিয়েট সরকার বিশেষত তার কর্ণধার স্ট্যালিন ১৯৩৯ সালের 'জার্মান-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি'র উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং সেজন্য সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলেন নি। তাই আচমকা জার্মান আক্রমণে 'অসতর্ক রাশিয়ার বিহ্বলতা'ই নাকি প্রকট হয়ে উঠেছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট সরকারের নেতৃত্বে আসীন সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভচক্র স্ট্যালিন নেতৃত্বকে মসীলিপ্ত করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিনের ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্ক তুলে দেয়।

এইসব অভিযোগকে মিথ্যা এবং ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন তৎকালীন সোভিয়েট মার্শাল ঝুকভ। তাঁর আত্মজীবনীতে (১৯৭৪) এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ''১৯৩৯ সালে জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন আমাদের দেশ জার্মানি ও জাপান — দুদিক থেকেই আক্রান্ত হতে পারত; এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, এই চুক্তি সম্পর্কে স্ট্যালিনের কোনপ্রকার মোহ ছিল। এই চুক্তির ফলে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে রেহাই পাবে না — সে সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েট সরকার সচেতন ছিল এবং সেই কারণে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য (এই অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে) আরও কিছুটা সময় আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। সর্বোপরি, সোভিয়েট বিরোধী ফ্রন্টের ঐক্যবদ্ধভাবে মাথা তোলার সম্ভাবনাকে আটকে দিয়েছিল। অনাক্রমণ চুক্তির উল্লেখ করে নিশ্চিন্ততাজ্ঞাপক কোন মতামত আমি স্ট্যালিনের মুখে কখনো শুনিনি।''

''১৯৩৯ থেকে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত জনগণ এবং পার্টি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

''আমাদের অগ্রসর শিল্প, যৌথখামার ব্যবস্থা, সার্বজনীন সাক্ষরতা, জাতিগত ঐক্য, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক শক্তি, জনগণের মহান দেশপ্রেম, পার্টির লেনিনীয় নেতৃত্ব — এই সবগুলিকে রণক্ষেত্র ও তার পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে যুক্ত করেই গড়ে উঠেছিল দেশের ব্যাপক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালী বুনিয়াদ এবং সেটাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েটের মহান বিজয়ের মূল উৎস। ...১৯৩৯ থেকে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময়টি একটি সামগ্রিক রূপান্তর হিসাবে চিহ্নিত ছিল; সে সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি প্রতিভাসম্পন্ন সেনাবাহিনীকে আরও মজবুত করেছিল এবং যা ছিল দেশরক্ষার জন্য দারুণভাবে প্রস্তুত।''

''যা হওয়া উচিত, প্রত্যেকটি জিনিস তেমনভাবে সংগঠিত করবার জন্য শান্তিকালীন যে সময়ের প্রয়োজন — ইতিহাস তা আমাদের দেয়নি। আমরা অনেক জিনিস ঠিকমত শুরু করেছিলাম, কিন্তু অনেক জিনিস সম্পূর্ণ করবার মত সময় আমরা পাইনি। ...এই দিকগুলিকে সমগ্র যুদ্ধকালব্যাপী নিরন্তর আরও ব্যাপক এবং আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। এবং সেগুলোই শেষপর্যন্ত বিজয় এনে দিয়েছে।''

তিনি বলেন, ''দেশের প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় করতে পার্টি ও সরকার ১৯৪০ সালে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই পদক্ষেপগুলিকে পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী করবার মতো প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আমাদের ছিলনা। সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠন, দক্ষতাবৃদ্ধি ও পুনঃপ্রশিক্ষণের কাজ এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধ প্রস্তুতি ও রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ গঠন প্রক্রিয়া চলতে চলতেই (অর্থাৎ প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই) আমাদের দেশের উপর যুদ্ধ চেপে বসে।''

জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি যতদূর সম্ভব চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে কতটা সময় পাওয়া যাবে — সেটাই ছিল সোভিয়েট নেতৃত্বের বিচার্য বিষয় এবং সেজন্যই অনাক্রমণ চুক্তির ফলে কিছুটা সময় যে পাওয়া গিয়েছিল — সেকথা কমরেড স্ট্যালিন ১৯৪১ সালে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বলেছেন, মার্শাল ঝুকভও সেটাই বলেছেন। তা না হলে প্রায় দু-বছর আগেই সোভিয়েটকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সামনে পড়তে হত। ঝুকভ লিখছেন, ''কাছাকাছি থাকা লোকজনদের সঙ্গে স্ট্যালিন আমার সামনে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, সেগুলি তুলনা ও বিশ্লেষণ করে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে, তাঁর সমগ্র চিন্তায় ও কাজে যুদ্ধকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হত...। নাৎসি জার্মানির মতো একটি শক্তিশালী ও ধূর্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে তা সোভিয়েট জনগণের উপর যে কী দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দেবে — স্ট্যালিন তা খুব ভাল করেই জানতেন। তাই, প্রস্তুতির প্রয়োজনে যতটা বেশি সময় পাওয়া যায়, সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের সমগ্র পার্টিও তাই করেছিল।'' তাই, জার্মান বিমান ৩২৪ বার সোভিয়েট সীমানায় ঢুকে প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টা করা সত্ত্বেও সোভিয়েট নেতৃত্ব জার্মানির উপর আগাম আক্রমণ হেনে বসেনি।

জার্মান বাহিনী সোভিয়েটের এত ভিতরে ঢুকতে পারল কী করে

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর অনেকে এমন প্রশ্নও তুলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন নাৎসি বাহিনীকে রাশিয়ার মাটিতে এতদূর ঢুকতে দিল কেন? নাৎসিরা যখন গ্রীস দখল করেছিল, যখন তারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই ছিল না তখনই আগেভাগে লালফৌজ যদি তাদের আক্রমণ করত তাহলে তো নাৎসিরা সেখানেই ঘায়েল হয়ে যেত। তা করা হল না কেন?

৩ জুলাই স্ট্যালিনের বেতার ভাষণে এর জবাব পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, ''১৯৩৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানি যে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই চুক্তি তারা লঙ্ঘন করেছে। ...আমাদের দেশ শান্তি চায়, চুক্তি লঙ্ঘনে আমরা অগ্রণী হতে চাইনি, বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে যাইনি।... বিশ্বাসঘাতকের মত চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে সোভিয়েট ইউনিয়নে হানাদারি চালিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানি কী লাভ করেছে এবং ক্ষতিই বা তার কী হয়েছে? এর দ্বারা অল্প সময়ের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় নিজের সৈন্য সমাবেশের সুযোগ জার্মানি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু গোটা দুনিয়ার চোখে নিজের রক্তপিপাসু হানাদার চরিত্র উদঘাটিত করে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে জার্মানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সামরিক দিক থেকে জার্মানির লাভটুকু নেহাতই একটা ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। অন্যদিকে যে প্রবল রাজনৈতিক লাভ সোভিয়েট ইউনিয়নের হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী, যেটা ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগামী দিনে লালফৌজের সামরিক বিজয়ের জমি তৈরি করে দেবে।'' এবং পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে, স্ট্যালিনের এই বক্তব্য কত যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল ছিল।

এ প্রসঙ্গে বৃটিশ লেখক প্যাট স্লোয়ান তাঁর 'রাশিয়া রেজিস্ট্‌স' গ্রন্থে লিখেছেন, ''প্রথমত, সমগ্র দুনিয়ার কাছে সোভিয়েট তার শান্তিমুখী ইচ্ছেটাকে প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয়ত, লালফৌজ যদি আগেই জার্মানিকে আক্রমণ করত তখন যা পরিস্থিতি হত, তার চেয়ে এখন জার্মানির অভ্যন্তরেই হিটলারের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছে।... তৃতীয়ত, লালফৌজ যদি আগেভাগে নাৎসি অধিকৃত এলাকা দখল করে নিত, তাহলে, 'বলশেভিকবাদের বিপদের' বিরুদ্ধে হিটলার নিজেকে ইউরোপের 'ত্রাতা' হিসেবে তুলে ধরার সুবিধা পেয়ে যেত। তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একথা ঘোষণা করতে পারতো না যে, 'আমি দেখছি রুশ সৈন্যরা তাদের মাতৃভূমির দরজায় দাঁড়িয়ে স্মরণাতীতকাল থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের কর্ষণ করা ভূমি রক্ষা করছে।' সোভিয়েট আক্রমণ করলে তখন বরং নাৎসিবাদের পৃষ্ঠপোষকেরা বিশ্বময় প্রচার করত যে, 'বলশেভিকরা হানাদার এবং সেই হানাদারির বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া তাদের মাতৃভূমি রক্ষায় লড়ছে।'

সোভিয়েট সম্পর্কে মিথ্যা ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে হিটলার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্মানির রক্ষাকর্তা হিসেবে জার্মানির জনমনে নিজের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিল; সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজের উপর জার্মান বাহিনীকে প্রথম আঘাত হানতে দিয়ে জার্মানির অভ্যন্তরে হিটলারের তৈরি করা জনপ্রিয় ভাবমূর্তিতে ফাটল ধরিয়ে দেয়। বৃটিশ এবং মার্কিন সরকারও তখন শত্রুতার পরিবর্তে সোভিয়েটের প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়। সেইসঙ্গে বিশ্বের দেশে দেশে কোটি কোটি জনগণ সমর্থন ও সহানুভূতি নিয়ে সোভিয়েটের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। এইভাবে সোভিয়েট তার আপাত সামরিক ক্ষতির বিনিময়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করেছিল।

''সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সুচিন্তিত নীতিকে ধরতে না পেরে নাৎসি শাসকেরা সম্ভবত লালফৌজের বর্তমান ক্ষমতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিল। তারা হয়ত এমনও ভেবেছিল যে, নাৎসিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে সফলতা অর্জনের ক্ষমতা সোভিয়েট সরকারের নেই। যেকোন মূল্যে দ্রুত বিজয় অর্জনের আশা নিয়েই তারা সোভিয়েটকে আক্রমণ করেছিল।''

সোভিয়েটে পঞ্চম বাহিনী পাওয়া যায়নি

হিটলারের জার্মান বাহিনী যখন ইউরোপের দেশগুলি দখল করতে করতে এগিয়েছে, তখন দেখা গেছে, বহু দেশেই জার্মানি নাৎসি-দোসর পেয়ে যাচ্ছে, যারা স্বদেশের বিরুদ্ধে হিটলারের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ ঘটনা অনেককেই বিস্মিত করে দেয়। আসলে, হিটলারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি দেশে গোপনে গড়ে তোলা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকদের ঘাঁটি। যাদের বলা হত পঞ্চমবাহিনী। এক এক দেশে এদের এক এক নাম। বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন দেহ হলেও এদের প্রত্যেকের হৃদস্পন্দন নাৎসি জার্মানির সঙ্গে জড়িত ছিল। এরা বিকৃত ফ্যাসিস্ট চিন্তায় দীক্ষিত, হিটলারের অন্ধ অনুগত, হিটলারের অর্থে পুষ্ট। এদের কাজ, নিজ নিজ দেশের সামরিক বাহিনীর কর্তা, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সামরিক উৎপাদনের কর্তা ইত্যাদিদের ঘুষ দিয়ে হিটলারের পক্ষে তৈরি করা; যাদেরকে বশীভূত করা সম্ভব নয় তাদের হত্যা করা; সে দেশের কলকারখানা ও যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ শিল্পকে ভিতর থেকে অন্তর্ঘাত চালিয়ে পঙ্গু ও অচল করে দেওয়া; এরপর হিটলারের ঝটিকাবাহিনী যখন সেইসব দেশে ঢুকেছে তখন অনায়াসেই জয়লাভ ঘটেছে। রাশিয়াতেও তেমন পঞ্চমবাহিনী গড়ে উঠেছিল, ডালপালাও বিস্তার করেছিল। লালফৌজের জেনারেল থেকে কয়েকজন পদস্থ অফিসার, রুশ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য পর্যন্ত এই পঞ্চমবাহিনীর অঙ্গীভূত হয়েছিল। এছাড়াও তার নীচের স্তরে নানান সমরাস্ত্র শিল্পের ম্যানেজার থেকে আরও নিচের স্তর পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল পঞ্চম বাহিনীর চক্রান্তের জাল। তারা অসংখ্য গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাত চালিয়েছে; দলের প্রথম সারির নেতা লেনিনগ্রাদ পার্টি সেক্রেটারি কিরভ, বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কীসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। স্ট্যালিন, ঝুকভ, ভরোসিলভ সহ সোভিয়েট নেতৃত্বের মূল স্তম্ভগুলোকে গুপ্তহত্যা মারফত সরিয়ে ফেলা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিনক্ষণও স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট পার্টি ও সরকার অত্যন্ত দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে পঞ্চমবাহিনীর ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। তাই ১৯৪১ সালে সোভিয়েট যখন আক্রান্ত হয় তখন হিটলার-বাহিনীকে সাহায্য করার মতো বিশ্বাসঘাতক শক্তি সোভিয়েটে পাওয়া যায় নি। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ই ডেভিস-এর সঙ্গে তৎকালীন সোভিয়েট বিদেশ সচিব লিটভিনভের সেসময় যে কথোপকথন হয় তার

সাতের পাতায় দেখুন

সংসদে জনতার কথা পৌঁছানোর পথ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা

তিনের পাতার পর

থাকা বিভিন্ন একচেটিয়া শিল্পপতি গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাতেরই প্রতিফলন মাত্র, তাও আজ একপ্রকার খোলা সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবল বাজার সঙ্কটে দীর্ণ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অবশ্য এছাড়া মালিকশ্রেণীর হাতে অন্য কোনও উপায়ও নেই। কারণ, আজ বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী যেকোনও উপায়ে সরকার ও প্রশাসনকে যদি নিজেদের কুক্ষিগত বা প্রভাবাধীন করে ফেলতে না পারে, তবে তীব্র সঙ্কটগ্রস্ত আজকের বাজারে তাদের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াবে। প্রবল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ও বাজারের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হলে তাদের আজ যে কোনভাবেই হোক না কেন নিজেদের লক্ষ্য পূরণের স্বার্থেই সরকার এবং প্রশাসনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা চাই। তাই শেষপর্যন্ত তারা এমন দল বা জোটকেই বেছে নেয় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকেই জিতিয়ে ক্ষমতায় আনে, যারা সেই বিশেষ সময়ে শাসক মালিকশ্রেণীর স্বার্থ সবচেয়ে ভালভাবে ও সবচেয়ে বেশি রক্ষা করতে পারবে। অন্যদিকে পরস্পর যুযুধান বিভিন্ন সংসদীয় দলগুলি বা তাদের বিভিন্ন স্থানীয় বা আঞ্চলিক সহযোগীরাও সরকারি ক্ষমতার এবং সেই সংক্রান্ত নানা সুযোগসুবিধার অংশীদার হয়ে উঠবার জন্য হামলে পড়েছে। ফলে তারাও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে — কে মালিকশ্রেণীর কতটা আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারে, বা কতটা ভালভাবে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে পারে। তারা কখনও ভান করে যেন তারা গরিবের ত্রাতা, কখনও বা সাজে যেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা আপসহীন যোদ্ধা, আবার কখনও ভান করে যেন অসহায় মানুষের সমস্ত দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটাতেই এই ধরাধামে তাদের আবির্ভাব। কেউ সাজে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়ন, কেউ বাগণতন্ত্রের ধ্বজাবাহক, কারুর বা আবার তাস সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। যদিও ভিতরে ভিতরে তারা সবাই সেই ধনতন্ত্রেরই অনুগত সেবক, মালিকশ্রেণীর কৃপা ও অনুগ্রহপ্রার্থী, যাতে ক্ষমতার লোভনীয় আসনটি শিকে ছিঁড়ে পড়ে তাদেরই ভাগ্যে।

সংক্ষেপে এই হল আজ পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেরই নির্বাচনী ব্যবস্থার বাস্তব চেহারা। তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিতেও এর মধ্যে সাধারণ মানুষের মতামতের কোনও প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া ভার। এই অবস্থায় তাই ''সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত, সাধারণ মানুষের নিজস্ব এক শাসনব্যবস্থা'' — গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞা আজ এক মিষ্টি স্বপ্নাতুর স্তোকবাক্যে পরিণত হয়েছে, যার আড়ালে বাস্তবে চলে একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন ও কুক্ষিগত এক শাসনব্যবস্থা, যার কাছে প্রকৃত জনগণের মতামতের লেশমাত্র মূল্যও নেই। তাই একদিন বুর্জোয়ারা নিজেরাই গণতন্ত্রের যে আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই করেছিল, আজ পুঁজিবাদের অনিরসনীয় তীব্র সঙ্কটের আবর্তে পড়ে তা তারা নিজেরাই আবার বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ইতিমধ্যেই জনমনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, নির্বাচনের সময়ে এই যে এত বেহিসেবী টাকা ওড়ে, তার উৎস কী, আর এর দ্বারা গণতন্ত্রের কোন্ স্বার্থটিই বা সিদ্ধ হয়? এর দ্বারা কি সমগ্র বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই এক নির্লজ্জ প্রহসনে পরিণত হচ্ছে না? এইভাবেই কি এই ধরনের নির্বাচন দিনের পর দিন চলতে থাকবে? এর কি কোনও শেষ নেই এবং থাকলে তা কত দূর? অন্তত এইটুকু আজ মানুষের কাছে পরিষ্কার যে, এই যে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী বিভিন্ন দলের পিছনে নির্বাচনের সময়ে এত টাকা খরচ করে, তা নিতান্তই পরোপকারের জন্য নয়। এর পিছনে তাদের নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। তাদের কাছে এই টাকাও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই এক ধরনের বিনিয়োগ মাত্র, যার লক্ষ্য সমগ্র প্রক্রিয়াটি এবং তার ফলাফল যাতে তাদের পক্ষে লাভজনক হয় তা নিশ্চিত করা। এইভাবে তারা বাস্তবে নিজেদের পছন্দমত অনুগত দল বা জোটকেই নির্বাচনে জিতিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং সে চেষ্টা সফল হলে তার জন্য যত টাকা বিনিয়োগ করেছিল তার বেশ কয়েকগুণ বাজার থেকে সুদে-আসলে তারা উসুল করে নেয়। আর ঠিক এইখানেই সাধারণ মানুষের স্বার্থও এই পুরো ব্যাপারটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। কারণ, নির্বাচনের পরে পুঁজিপতিগোষ্ঠী যখন নিজেদের সুবিধামত নির্বাচনে তাদের বিনিয়োগ করা টাকা উসুল করতে থাকে, সেই টাকা তারা যেকোনওভাবেই হোক সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দিন-আনি-দিন-খাই মানুষের পকেট কেটেই আদায় করে। তারা খুব ভালভাবেই জানে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে পুঁজিপতিশ্রেণীর যে দল বা জোটই ক্ষমতায় আসুক, তাদের খুব একটা ক্ষতি নেই। তারা সর্বোচ্চ মুনাফা লুটবার উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবসা ভালভাবেই চালাতে পারবে এবং সেই সুবাদে নিজেদের পকেটও পুরোপুরি ভরতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদের যেখানে যতটুকু অসুবিধে হবে, তা দেখবার জন্যই তো সরকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, কালো টাকা উদ্ধার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেক বড় বড় কথা বলা হলেও, আজ পর্যন্ত তা উদ্ধারের জন্য কোনও ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকেই কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বা কোনও আইনই এই কালো টাকার বিকল্প অর্থনীতির সামনে প্রকৃত কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। কারণ, এই কালো টাকার অস্তিত্ব বাস্তবে আজ মালিকশ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নের সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে, তা যতই বেআইনি হোক না কেন, তা নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করা আজ আর কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তা আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই এক বাধ্যবাধকতা। আর ঠিক এই কারণেই সমস্ত নির্বাচনী ব্যয়ই রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও পুরো নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে, এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার নীট ফল দাঁড়াবে এই যে, যে সব রাজনৈতিক দল এইভাবে মালিকশ্রেণীর কৃপাধন্য হয়ে ক্ষমতায় আসীন হবার লক্ষ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে নোংরা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলায় মত্ত, তাদের পিছনে কালো টাকার স্রোত তো একইভাবে বজায় থাকবেই, তার সঙ্গে যুক্ত হবে জনগণের টাকা নিয়েও যথেচ্ছভাবে নয়ছয় করবার অধিকার। আর সেই সূত্রে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী আরেকটু চেষ্টা করবে নির্বাচনের নামে জনগণের টাকার এই বিপুল অপব্যয়ের উপর একটা তথাকথিত স্বচ্ছতার আবরণ সৃষ্টি করতে, যাতে এই নিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তা চাপা দেওয়া যায় এবং এই সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে যে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে আবার কিছুদিনের জন্য একটা আড়াল জোগান দেওয়া যায়।

এখানে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যখন কমিটি শুধুমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্বাচনী খরচ জোগানোর প্রস্তাব দেয়, আবার একই সাথে এই ব্যবস্থা সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে বলে দাবি করে, তখনই তার মধ্যে মারাত্মক ভণ্ডামি ও ভাঁওতাবাজি প্রকাশ পায়। এমনকী বুর্জোয়া অর্থেও নিরপেক্ষতা শব্দের অর্থ এটা হতে পারে না। নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা কথাটির অর্থ হল এই যে, প্রত্যেক প্রার্থী, যারা নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তারা কর্তৃপক্ষের কাছে সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং একই রকম ব্যবহার পাওয়ার দাবিদার হবে। সেখানে কে বেশি লোকের বা বড় স্বীকৃত দলের আর কে কম লোকের বা ছোট অস্বীকৃত দলের প্রতিনিধিত্ব করছে, তা কোনও প্রশ্নই নয়। কিন্তু এখানে কমিটির প্রস্তাবিত বড় স্বীকৃত দলগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার 'সমতা' কথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে ছোট বা অস্বীকৃত দলগুলির কাছ থেকে নির্বাচনে লড়ার অধিকারই কেড়ে নেওয়া বা তাদের সামনে নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, অন্যকথায় এর মানে দাঁড়ায়, একদিকে শাসক মালিকশ্রেণীর আস্থাভাজন এবং আশীর্বাদধন্য দলগুলিকে আরও দীর্ঘায়ু করা এবং সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে এই দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলা, যাতে মালিকশ্রেণীর শাসন আরও মসৃণ ও নিষ্কণ্টক হয়, এবং অন্যদিকে একই সাথে যেসব কণ্ঠস্বর, শক্তি বা দল মালিকশ্রেণীর স্বার্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে না দিয়ে এই ব্যবস্থার ন্যায্যতা ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, সমস্যাগুলির মূল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এবং মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে, তাদের হাত থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার কেড়ে নিয়ে এবং নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করা। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থাকে মালিকশ্রেণীর আস্থাভাজন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলা এবং দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়িত করাই হচ্ছে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর বর্তমান লক্ষ্য।

এখন, এই রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচনের প্রশ্নে সিপিআই-সিপিএমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। তাদের সমস্ত বামপন্থী বুলি ও স্লোগান সত্ত্বেও তারা কিন্তু এই প্রস্তাবকে সমর্থনই করেছে। এমনকী যে কমিটি এই প্রস্তাব এনেছে তারও অত্যন্ত উৎসাহী গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হল এরা। আসলে শাসকশ্রেণী এবং তাদের আস্থাভাজন বিজেপি বা কংগ্রেসের পক্ষে এদের স্লোগান সর্বস্ব রাজনীতির স্বরূপ ভেদ করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তাই তারাও সোৎসাহে এই জনবিরোধী পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে এইসব তথাকথিত বৃহৎ বামপন্থী দলগুলিকে সামিল করতে মোটেও কুণ্ঠিত হয়নি।

অর্থাৎ, এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে, বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি একেবারে গোড়া পর্যন্ত পচে গেছে। নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের প্রায় কোনও আবরণই এখন আর তাতে অবশিষ্ট নেই। তাই এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ন্যূনতম রেশটুকু বজায় রাখতে হলে বা কারচুপি কিছুটা রুখতে হলেও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে নিজেদের উপরই নির্ভর করতে হবে। সেই লক্ষ্যে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর সেইসঙ্গে মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, কোনও নির্বাচনের মাধ্যমে, তা যতই অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে দাবি করা হোক না কেন, সরকার পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-দারিদ্র্যের কোনও সমাধান সম্ভব নয়। কারণ এই ব্যবস্থায় কোনও সরকারের পক্ষেই এই ব্যবস্থার মূল নিয়মগুলির বিরুদ্ধে গিয়ে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় কোনও ব্যবস্থার মাধ্যমেই নির্বাচনে কালো টাকার এই জোয়ার বন্ধ করা। একমাত্র সংগঠিত তীব্র গণআন্দোলনই পারে এই ব্যবস্থায় সংসদীয় চৌহদ্দির বন্ধ জলার মধ্যে মানুষের প্রকৃত দাবিকে তুলে ধরতে। কারণ এছাড়া তাদের বধির কানে সাধারণ মানুষের দুঃখ- দুর্দশা বা দাবি-দাওয়ার আজ আর কোনও প্রবেশাধিকার নেই। আমাদের দল এস ইউ সি আই সর্বদাই মানুষের প্রকৃত সমস্যা ও দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা এরকম যেকোন আন্দোলনের পাশে থাকবে ও তা গড়ে তোলার চেষ্টা চালাবে।

লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

একের পাতার পর

বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। তবে একথা অবশ্যই বোঝা যায় যে, এই বোমাকাণ্ডের সঙ্গে ইরাক ও আফগানিস্থানে, মার্কিন-ব্রিটিশ হানাদারি, হত্যা, দখলদারির সম্পর্ক রয়েছে।

জি-৮ গোষ্ঠীর শীর্ষ বৈঠক উপলক্ষে স্কটল্যান্ডে উপস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছেন, ''সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।'' ইঙ্গিত স্পষ্ট। ইরাকে মার্কিন দখলদারি বজায় রাখতে হত্যা, ধ্বংস ও অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়বে। আমেরিকা, ব্রিটেন সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বেকারি ও মজুরি হ্রাসের কারণে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে, আবার আন্দোলনমুখী মন জাগছে, তাকে দমন করার জন্যই, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে দমনমূলক কালাকানুনের কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

বুশ-ব্লেয়ার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছেন। ওদের প্রতিটি বিবৃতি মিথ্যা। সত্য হল, ইরাক, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, হাইতিতে বুশ-ব্লেয়ার যা করছে — তা বর্বর সন্ত্রাস ছাড়া কিছু নয়। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও দখলদারির পিছনে, গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের বা সন্ত্রাসবাদের বিপদের যে কথাগুলো বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সোজা সরল সত্য হল, আমেরিকা ও ব্রিটেনের একচেটে পুঁজিপতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মুনাফার লালসাই ইরাকে, আফগানিস্তানে, প্যালেস্টাইন ও হাইতিতে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরিয়ে চলেছে।

লন্ডনের ঘটনায় নিহত নিরপরাধ মানুষগুলির শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাই, তাদের শোকের আমরাও সাথী। তবে আমাদের আবেদন, এই যুদ্ধের যারা হোতা, তারা যেন আরও আক্রমণ, হত্যা ও ধ্বংস চালাবার জন্য লন্ডনের ঘটনাকে, জনগণের শোককে ব্যবহার করতে না পারে। ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে বোমাকাণ্ডকে মুখ্য বিষয় করে, স্কটল্যান্ডে জি-৮ গোষ্ঠীভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লুঠেরা শাসকদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ব্লেয়ার সরকারের বিরুদ্ধে বিশাল গণবিক্ষোভের সংবাদ কার্যত পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই বোমাকাণ্ডকেই অজুহাত করে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকরা নিজ নিজ দেশে দমনমূলক অগণতান্ত্রিক কালা কানুনের ফাঁসকে আরও শক্ত করার চেষ্টা করবে, যেটা শেষপর্যন্ত তারা শ্রমজীবী ও অত্যাচারিত জনগণের ক্রমবর্ধমান ন্যায্য সংগ্রামগুলির বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। গভীর শোকের মধ্যে ব্রিটেন তথা ইউরোপের জনগণকে এ সত্য খেয়ালে রাখতে হবে। আমেরিকা ও এশিয়ার জনগণের মধ্যেও একই সতর্কতা দরকার।

সরকার বিদ্যুৎনীতি না পাল্টালে বিক্ষুব্ধ মানুষ পথে নামতে বাধ্য হবে

একের পাতার পর

করে ফিক্সড চার্জ চালু করা হয়েছে, যার ফলে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রশিল্পের গ্রাহকদেরও মাশুল বেড়েছে ভাল পরিমাণে। পর্ষদ ছাড়া রাজ্যের আর কোনও বিদ্যুৎ সংস্থা ক্ষুদ্রশিল্পে এইভাবে প্রতিমাসে ফিক্সড চার্জ দিতে বাধ্য করছে না। একই রাজ্যে দু'রকমের ব্যবস্থা কী করে চলতে পারে? জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে গরিব গৃহস্থকে ৩০ ইউনিট পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ দিতে বলা হলেও এ রাজ্যে তা কার্যকর করা হয়নি। তাই ক্ষুদ্রশিল্পের উপর চাপানো ফিক্সড চার্জ প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে। একথা পরিষ্কার যে, লাইসেন্সির মাশুল-ক্ষুধা মেটাবার জন্য খাদ্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে রাজ্যের গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার, ক্ষুদ্র চাষী এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে। এ কথা সকলেই জানেন যে, এই ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষির উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে রাজ্যের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ। এই নিরপরাধ নিপীড়িত নির্বিরোধী সাধারণ মানুষকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যদি নিজের স্বচ্ছতা রক্ষা করে বণ্টন ও সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ ১৫ শতাংশে নামিয়ে এনে এবং সি ই এস সি ১০ শতাংশে নামিয়ে এনে মাশুল নির্ধারণ করে, তা হলে কোনও লোকসান বা ভর্তুকি ছাড়াই গড় মাশুল ২ টাকা ইউনিটের বেশি হবে না।

এরপরে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ৬২(৩) ধারা — যেখানে মাশুল পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে সেই ধারাটি — জনস্বার্থমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যদি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে অনেক কম দামে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব। সেই কারণেই বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করে অবিলম্বে কৃষিতে বিনা পয়সায় এবং ক্ষুদ্রশিল্পে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি তোলা হয়েছে।

সি ই এস সি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আজ শুধু জনস্বার্থবিরোধী মাশুল নীতিই গ্রহণ করেনি, ধীরে ধীরে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী, গ্রাহক স্বার্থবিরোধী একটি বেনিয়া রুচিসম্পন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নরুচির ফলে পর্ষদ একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও দ্বিচারিতার পথ নিয়েছে। পর্ষদ এবং সি ই এস সি মুখে বড় বড় কথা ব'লে ভিতরে ভিতরে যেকোন ভাবেই হোক রাজস্ব উপার্জনের রাস্তা গ্রহণ করেছে। এই টাকা বা রেভেনিউ বাড়াবার জন্য কমিশনের নির্দেশ, সরকারি নির্দেশ অমান্য করা, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, স্বৈরাচারী ভূমিকা গ্রহণ — এক-কথায় যেকোন অন্যায় পথ নিতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করছে না। নূতন কানেকশনের আবেদনকারীর কাছ থেকে আইন ও রেগুলেশনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অতিরিক্ত সিকিউরিটি আদায়, ট্রান্সফর্মারের জন্য টাকা আদায় এবং যন্ত্রপাতির টাকা আদায় করা হচ্ছে। বন্ধ মিটার, খারাপ মিটারের জন্য ভাড়া আদায় এখনও চলছে। যতদিন না বকেয়া টাকা মেটাবে ততদিন ট্রান্সফর্মার না পাল্টানো, একজনের বকেয়া অপরের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা, প্রেমিসেসে বকেয়া থাকলে নূতন আবেদনকারীর কাছ থেকে সেই টাকা আদায় হচ্ছে। এখনও লোডভিত্তিক অ্যাভারেজ বিল করা, বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীন একই ক্ষুদ্রশিল্পের কাছ থেকে তিন রকমের মিটার ভাড়া আদায় (৪৫/৩০০/৪০০ টাকা) করা হচ্ছে।

এইটুকুই নয়, মিটার পুড়ে গেলে তা পরীক্ষা না করেও গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ তুলে লক্ষ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে আদায়ের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ হল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অসংগঠিত থাকার সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকাবার সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার নামে সরকারের স্বৈরাচারী ভূমিকাও লক্ষ্য করার মত। পৃথিবীর আর কোথাও এমন গণতান্ত্রিক আইন আছে বলে আমাদের জানা নেই যে, কোনও প্রমাণ ছাড়াই একজনকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে এবং সেই শাস্তি অভিযোগকারী নিজেই দেবে। এই ধরনের আইন এবং তার প্রয়োগ খুব সম্ভবত হিটলার ছাড়া আর কেউ করতে পারেনি। বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের নামে এই হিটলারি-স্বৈরাচারী আক্রমণ এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা মনে করি, বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের জন্য চুরি সন্দেহে বিদ্যুৎ লাইন কাটা যেতে পারে, কিন্তু লাইন কাটতে হবে গ্রাহকের উপস্থিতিতে এবং কী কারণে লাইন কাটা হল তা লিখিতভাবে গ্রাহককে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে। কোর্টে এ বিষয়ে যে মামলা দায়ের হবে, সেখানে চুরি প্রমাণ হলে তবেই গ্রাহককে আর্থিক শাস্তি অথবা জেল দেওয়া যেতে পারে। মামলার রায় প্রকাশের আগে কোনরকমের শাস্তি দেওয়া চলবে না। বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের নামে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং সি ই এস সি'র অত্যাচারে আজ রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প উঠে যেতে শুরু করেছে। যে রাজ্যে বৃহৎশিল্প প্রায় সবই বন্ধ, সেই রাজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প এবং কৃষিতে যদি ব্যাপক সঙ্কট দেখা দেয়, তাহলে রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়তে বাধ্য। তাই বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিশ্বায়নের অর্থনীতির ভিত্তিতে তৈরি বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-কে কার্যকর করার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। জনগণের অর্থে তৈরি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আজ বাণিজ্যিক সংস্থাতেই শুধু পরিণত হয়নি, পরিণত হয়েছে বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎশিল্প গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠনে। এ কাজ সম্পূর্ণভাবে জনস্বার্থ বিরোধী। এই পরিবর্তনের ফলেই আজ গ্রাহকদের সাথে পর্ষদের সম্পর্ক শত্রুতায় পরিণত হতে চলেছে। পর্ষদের এই চরিত্র কোনমতেই অভিপ্রেত নয়। এ অবস্থার অবিলম্বে পরিবর্তন হওয়া দরকার। বস্তুত পরিস্থিতি আজ যে দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে সরকার যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থকে এভাবেই অবহেলা করতে থাকে, তবে জনগণের সামনে আন্দোলন ছাড়া পথ থাকবে না।

এস ইউ সি আই এবং অ্যাবেকা দাবি তুলেছে — জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করতে হবে; তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ নীতি বাতিল করতে হবে ; বণ্টন ও সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ সি ই এস সি-তে ১০ শতাংশ আর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ১৫ শতাংশ-এর বেশি গ্রাহ্য করা চলবে না; বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করতে হবে ; কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিতে হবে ; গরিব গৃহস্থকে ৩০ ইউনিট পর্যন্ত ৫০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ দিতে হবে ; গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে; বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে বিনা বিচারে আর্থিক শাস্তি দেওয়া চলবে না। এই দাবিগুলির ভিত্তিতে ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি জেলায় বেলা ২টা থেকে ৩টা, রাস্তা অবরোধ করা হবে; জুলাই-আগস্ট মাসব্যাপী ১০০০টি শহর/গঞ্জ/অঞ্চল থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে; সরকার কর্ণপাত না করলে লাগাতার বর্ধিত কৃষি বিল বয়কট শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর জীবনাবসান

আগরপাড়া-কামারহাটি অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড আব্দুল হক গত ৩ জুলাই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড আব্দুল হক ১৯৫৪ সালে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। আগরপাড়া জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যাঁরা পত্তন করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি জুট মিলে ওয়ার্কার্স কমিটিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৯০ সালে কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি ট্রেড ইউনিয়ন এবং দলের আবেদনকারী সদস্য হিসাবে দলের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দুই ছেলেকেও তিনি দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন শ্রমিকদের স্বাভাবিক নেতা। ১৫ জুলাই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে ডি এম দপ্তরে অভিযানের যে কর্মসূচি ছিল, সেই অভিযানে তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে মৃত্যুর দু'দিন আগেও অসুস্থ শরীর নিয়েও ব্রতী ছিলেন। প্রিয় নেতার মৃত্যুতে কামারহাটি এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি এবং দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সনৎ দত্ত কমরেড আব্দুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর দুই ছেলের কাছে শোকবার্তা পাঠান। কমরেড আব্দুল হকের মরদেহ ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে আসা হলে মরদেহে মাল্যদান করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল সেন, পার্টি ইউনিটের পক্ষে কমরেড রত্না দত্ত এবং কমরেডস মহঃ রিজওয়ান, কামরুদ্দিন, ফারুক, আব্দুল হামিদ প্রমুখ মিল ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

কমরেড আব্দুল হক লাল সেলাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

পাঁচের পাতার পর

অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। ডেভিস প্রশ্ন করেন ঃ "দেশের যারা বড় বড় জেনারেল, যারা দেশের বড় বড় মাথা, তাদের যদি এমনভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে স্ট্যালিন কাদের ভরসায় জার্মানির দুর্ধর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন?

লিটভিনভ ঃ একটা কথা কি জানেন, আপনাদের আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কতখানি শক্তি আছে, আপনারা স্বীকার করতে চান না। আমরা সকলেই সেই সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উঠে এসেছি। তাই আমাদের বিশ্বাসের মূল একটু স্বতন্ত্র।

ডেভিস ঃ আপনার কথা স্বীকার করে নিলেও, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা যুদ্ধের মধ্যে বসে রয়েছি এবং হিটলার প্রস্তুত। সে আপনাকে নতুন শক্তি তৈরি করতে সময় দেবে না।

লিটভিনভ ঃ কাজেই কোনও দিক থেকেই আজ আর অপেক্ষা করা যে চলে না — এটা আপনার কথা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। ধীরে সুস্থে কোন কিছু করবার সময় এটা নয়। এখন আমাদের কথাটা শুনুন। আমার বক্তব্য হল, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে যে জিনিস চাইছে, সে জিনিস ষোল আনা এইভাবেই সোভিয়েট রাশিয়া তাদের দিতে পারে। হিটলারের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাধবে, সেই যুদ্ধে যদি দেশের ভেতরে এতগুলো শক্তিশালী লোক সোভিয়েটের বিরুদ্ধতা করবার জন্য বেঁচে থাকে তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া কখনোই জার্মানিকে হারাতে পারবে না। জার্মানিকে হারানোর জন্যই সোভিয়েট রাশিয়াকে একান্ত নির্মমভাবে তার ভবিষ্যৎ কাঁটাগুলো সরিয়ে ফেলতে হল। এবং অচিরেই দুনিয়া একদিন বুঝতে পারবে যে, আমরা কী করেছি। ...আমরা হিটলারি নাৎসি বিশ্ব আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের যেমন সুরক্ষিত করছি, তেমনি তার দ্বারা আমরা সমগ্র বিশ্বের সেবা করে যাচ্ছি।..."

১৯৪১ সালে হিটলার-বাহিনীর আক্রমণের সময়ে সোভিয়েট যদি ১৯৩৬-৩৭ সালের অবস্থায় থাকতো তাহলে পৃথিবীর মানচিত্রের চেহারা যে কী হত বলা কঠিন। (ক্রমশ)

নদীয়া

হরিণঘাটায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির কনভেনশন

গত ২৬ জুন হরিণঘাটার নগরউখড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক অরিন্দম ভৌমিকের সভাপতিত্বে কনভেনশনের কাজ শুরু হয়। এরপর প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং ডাঃ পলিন মণ্ডল, ডাঃ বাসুদেব মণ্ডল, ডাঃ বিপুল সাহা, ডাঃ আজিজুল হক, শিক্ষক বিষাণ সিংহ ও জেলা সম্পাদক দাউদ গাজি প্রস্তাবের উপর বক্তব্য পেশ করেন এবং সকলের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ১২০০০ গ্রামীণ হাসপাতাল ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাবার সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছে এবং গ্রামীণ ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন করা বা ঔষধ দেবার অধিকার নেই — এই ফতোয়া জারি করেছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সভাপতি প্রধান শিক্ষক অরিন্দম ভৌমিক বলেন, সঠিক আন্দোলন সঠিক নীতিতে হলে জয় তার হবেই। শিক্ষক অরিন্দম ভৌমিক, ডাঃ বিনয় ভূষণ চৌধুরী, ডাঃ গৌরাঙ্গ দাসকে উপদেষ্টা করে ১৭ জনের হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠন করা হয়।

মধ্যপ্রদেশে গঠিত হল বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি

গত ২৬ জুন জবলপুরের ডাঃ আম্বেদকর ভবনে অনুষ্ঠিত হল মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এম এল চক্‌সে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবি সংবলিত প্রস্তাব সভায় পেশ করেন এম এল অগ্রবাল এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সোনি মাস্টার, তপন চক্রবর্তী, সাগরের প্রতিনিধি রাম অবতার শর্মা, ভোপালের প্রতিনিধি জে সি বাড়ই, হোরিলাল বিশ্বকর্মা, জৈন সিংহ সোন্‌ধা, রাজীব, ছত্তর সিং, গণেশ রাও প্রমুখ। সম্মেলনে রাজ্য বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে এম এল অগ্রবাল ও পোষণ প্রসাদ কুশবাহা।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদ

মুজফ্‌ফরপুর

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এবং সি পি আই (এম), সি পি আই সমর্থিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে এস ইউ সি আই'র পক্ষ থেকে গত ২২ জুন এক সুসজ্জিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কল্যাণী চকে পৌঁছায়। সেখানে ইউ পি এ সরকারের তেলমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ কুমার সিং, জেলা সম্পাদক কমরেড রামসুরত ঠাকুর, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লখিচন্দ্র রায় এবং কমরেড মোঃ ইদ্রীস।

জলপাইগুড়ি

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ৭ জুলাই এস ইউ সি আই জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত একটি গণমিছিল শহর পরিক্রমা করে স্থানীয় কদমতলায় প্রবল বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভের জেরে শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলায় বেশ কিছুক্ষণ যানচলাচল ব্যাহত হয়। বিক্ষোভে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্‌ রবি রায়, জীবন সরকার, দেবাশীষ সাহা প্রমুখ।

দার্জিলিং

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ৪ জুলাই এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল এয়ার ভিউ মোড় থেকে শুরু হয়ে কোর্ট মোড়ে এসে শেষ হয়। কোর্ট মোড়ে কিছু সময়ের জন্য পথ অবরোধ করা হয়। বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৬ জুলাই কলেজ স্ট্রীটে ডি ওয়াই ও'র বিক্ষোভ

কাঁথিতে মেধা তালিকার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির দাবি আদায় করল ডি এস ও

আন্দোলন করে, মার খেয়ে কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজে প্রথম বর্ষে মেধা তালিকার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির দাবি আদায় করল এ আই ডি এস ও।

মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ গত ৪-৫ জুলাই সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, তাদের সাথে আলোচনা করে দিন ঘোষণা করা হয়নি, এই অজুহাত তুলে ভর্তি বানচাল করে দেয়। ফলে তালিকাভুক্ত ৬০-৭০ শতাংশ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ঐ দিনই ক্ষুব্ধ ছাত্র ও অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে ডি এস ও অধ্যক্ষের কাছে বঞ্চিত ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থার দাবি জানাতে গেলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গুণ্ডাবাহিনী চড়াও হয় এবং ছাত্রনেতা কমরেড অপূর্ব পালকে মারতে মারতে কলেজ থেকে বের করে দেয়। এরপরই ডি এস ও ছাত্র-অভিভাবকদের সংগঠিত করে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। শহর জুড়ে মিছিল ও পথসভা করে জনগণকে সমস্ত ঘটনা জানায়। পরের দিন আবার কলেজে অধ্যক্ষের কাছেও একই দাবি জানানো হয়। জনমত ও আন্দোলনের চাপে অবশেষে, তৃণমূল ছাত্রপরিষদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ মেধাতালিকার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির জন্য পুনরায় দিন ধার্য করতে বাধ্য হয়।

এ আই ডি এস ও'র মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানস প্রধান জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদে ক্ষমতাসীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ভর্তির ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ করে চলেছে। ছাত্র-অভিভাবকদের প্রতারিত করে হাজার হাজার টাকা লুঠ করছে। বস্তুতঃ কাঁথি কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের টাকা রোজগারের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ছাত্র ভর্তিতে স্বচ্ছতা আনতে ডি এস ও আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে তিনি জানান।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও'র বিক্ষোভ

এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে এবং ভর্তির ফর্মের দামবৃদ্ধি, শিক্ষার ফিবৃদ্ধি, বিপুল ব্যয়সাধ্য সেল্ফ ফিনানসিং কোর্স চালুর বিরুদ্ধে ৭ জুলাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অভিযানে সামিল হন বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং হুগলি জেলার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর সুসজ্জিত মিছিল বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে রওনা হয়ে শহর পরিক্রমা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছায়। সেখানে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সুচেতা কুণ্ডু। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহসভাপতি কমরেড মৃদুল দাস এবং কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কলেজের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন, অনেক ক্ষেত্রে ফর্মের দাম যথেচ্ছ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে বলেও জানান। সমাবেশ থেকে ৬ জনের এক প্রতিনিধি দল নয় দফা দাবি নিয়ে উপাচার্যের নিকট স্মারকলিপি জমা দেয়। যার টাকা আছে সেই উচ্চশিক্ষা পাবে — উপাচার্যের এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন প্রতিনিধিরা।

কমসোমল-এর শিক্ষাশিবিরে

উন্নত চরিত্র গড়ে তোলার আহ্বান

গত ২৭-২৮ জুন এস ইউ সি আই-এর কিশোর সংগঠন কমসোমলের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বাছাই করা ১৪২ জন কমসোমল কর্মী এই শিবিরে অংশ নেয়।

এস ইউ সি আই এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর লেখা 'কমসোমল' ও 'ভারতের মাটিতে কমসোমলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ' বই দুটির উপর এই শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও পার্টির পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে 'কমসোমল' পুস্তিকাটি প্রতিনিধিদের পড়ে শোনানোর পরে তাদের কাছ থেকে আসা প্রশ্নসমূহ নিয়ে কমরেড সৌমেন বসু আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে — বর্তমানে সমাজে নীতি-নৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত অধঃপতন তা মানুষকে এমনকী কিশোর-কিশোরীদেরও মায়া-মমতা-ভালবাসা-বিবেকহীন এক মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করছে, জীবনে কোনো নীতি-আদর্শের বালাই থাকছে না। দেশের কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক এই সঙ্কট থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। এর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গেলে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা কিশোর বয়স থেকেই করা দরকার, যা তাদের সৎ, নিষ্ঠাবান, সামাজিক দায়িত্বপালনে অগ্রণী নাগরিক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে শেখায়। আজকের যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই সেই উন্নত জীবনবোধের সন্ধান দিতে পারে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ কীভাবে ভেঙে গেল, শ্রেণী বিভাগ কায়েম হল, মালিকানা ব্যবস্থা কায়েম হল, কীভাবে শ্রেণীবিভাগ ও সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত সাম্যবাদী সমাজ কায়েম হবে — মহান মার্কসের চিন্তার আলোকে কমরেড শিবদাস ঘোষের এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ তিনি তুলে ধরেন। তিনি দেখান, কীভাবে দেশের বরেণ্য মনীষীরা উন্নত হৃদয়বৃত্তি ও মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়ে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে কিশোর বয়স থেকেই সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই চরিত্রগুলির শিক্ষা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের বিজ্ঞানভিত্তিক পথনির্দেশ নিয়ে আজ মহৎ বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সাধনা করতে হবে।

তৃতীয় অধিবেশনে 'ভারতের মাটিতে কমসোমলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ' পুস্তিকাটি পড়িয়ে শোনানোর পরে জানতে চাওয়া হয় তারা বইটি থেকে কী পেয়েছে? সময়াভাবে মাত্র ১২ জন প্রতিনিধি বলার সুযোগ পায়। প্রত্যেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিভিন্ন দিক এবং ক্যাম্পের সুন্দর পরিবেশ, নিয়মশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের আবেগপূর্ণ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে। এরপর কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় কিশোর বয়স থেকেই প্রকৃত মানুষ হিসাবে নিজেকে কীভাবে গড়ে তুলতে হয় সে সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা এবং নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজকের কিশোর-কিশোরীদের, যারা নিজেদের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে চায় — তাদের সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করেন।

এই শিক্ষাশিবির অংশগ্রহণকারী কর্মীদের মনে গভীর আবেগ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে।

উত্তর ২৪ পরগণা

বসিরহাটে ছাত্রীভর্তি বন্ধের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি চলাকালীন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশে বসিরহাট হাইস্কুল ও বসিরহাট টাউন হাইস্কুলে হঠাৎ ছাত্রীভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র প্রতিনিধিরা ৮ জুন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করেন। সংসদের নির্দেশ অমান্য করতে পারবেন না জানিয়ে প্রধানশিক্ষক স্কুল বন্ধ করে দেন। ২৭ জুন স্কুল খুললে এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে আবার তাঁকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ কার্যকরী কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার ৩০ জুন ডি এস ও'র নেতৃত্বে বসিরহাট টাউন হাইস্কুলে ছাত্রধর্মঘট পালিত হয় এবং একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের রাস্তা পরিক্রমা করে। এরপর ছাত্ররা বাধ্য হয়ে স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদক ও প্রধানশিক্ষককে ঘেরাও করে রাখে। অবশেষে প্রধান শিক্ষক সংসদের সেক্রেটারির শরণাপন্ন হলে তিনি ছাত্রীদের ভর্তির দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in